এ জন্য ওঁকে অবশ্য অনেক ধরাধরি করতে হয়েছিল, তবু উনি হার মানেননি।

একবার পুতুলের জন্যে একটা ফ্রক তৈরি করে দিয়েছিলেন। যেমন সুন্দর ডিজাইন তেমন সুন্দর বাসন্তী রং। পুতুল ওটা সরস্বতী পুজোর দিন পরেছিল। বন্ধুরা বলেছিল ওকে নাকি দারুণ মানিয়েছে — অনেকটা প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার মতো লাগছে। তবে আসল ব্যাপারটা ঘটেছিল সেদিন সন্ধ্যাবেলায়। ঠাকুর দেখে ফেরার সময় ওদের বাড়ির সামনেই কমলদা হঠাৎই ওকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খেয়েছিল।

আচমকা ঘটনাতে পুতুল কেমন যেন চমকে গিয়েছিল, প্রতিবাদ করার সুযোগ পায়নি। আর কাজটা করে ফেলে কমলদাও কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল। কী করবে — কী বলবে বুঝতে না পেরে কান টান মুলে ওর কাছে ক্ষমা চেয়েছিল।

রাগ না করলেও পুতুল লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল। অন্য রকম একটা অনুভূতিতে যেন অবশ হয়ে পড়েছিল, বুকের ভিতরটাও ঢিপ ঢিপ করে উঠেছিল। কেউ দেখে ফেলবে ভেবে ভয়ও পেয়েছিল।

এখন অবশ্য ভাবতে গেলে আর ভয় লাগে না, উল্টে একটা অন্য ধরনের ভালো লাগা সারা শরীরে যেন ছড়িয়ে পড়ে। কমলদাকে কাছে পেতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু ও কাছে পেতে চাইলে কী হবে — সেইদিন থেকেই কমলদা ওকে কেমন যেন এড়িয়ে চলে। একা কথা বলা তো দূরের কথা দোকান ভর্তি লোকের সামনেও কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে যায়। ও হাজার কথা বললেও হুঁ আর হ্যাঁ ছাড়া কোনও উত্তরই দেয় না। শুধু থালার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ খেয়ে যায়।

তবে পুতুল কিন্তু এখন আর বৃষ্টি পছন্দ করে না, আর সে বৃষ্টি যদি এমন ঝিপঝিপে বৃষ্টি হয় তবে তো একদমই না। আসলে এই বৃষ্টিগুলোতেই হয় সবচেয়ে মুশকিল, চট করে থামতেও চায় না, মাঝখান থেকে কাজের সময় ভিজে মরতে হয়। কালও ঠিক তাই-ই হয়েছে — সারা দিনে অনেকবার ভিজতে হয়েছে। আর তাই সকাল থেকে গা-টা যেন ম্যাজ ম্যাজ করছে, মাথাটাও ভীষণ ধরেছে।

প্রথমে ভেবেছিল আজ আর বেরোবে না, মধুদাকে ফোন করে চালিয়ে নিতে বলবে। মধুদা ওদের রান্নার ঠাকুর, ওর বাবার সময় থেকে চাকরি করছে। মাঝে কিছুদিন ছিল না, ওড়িশায় দেশে ফিরে গিয়েছিল। এখন আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু পরেই মনে হল এখন আবার মাস পয়লা। এখন কামাই করাটা ঠিক হবে না — যারা মাস মেয়াদের চুক্তিতে খায় তারা টাকা দিতে দেরি করার সুযোগ পেয়ে যাবে।

... ...

চারদিন কেটে গেল — কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কমল মাত্র একটার বেশি সেপারেটার তৈরি করে উঠতে পারল না। অথচ ওর হিসাব অনুযায়ী এই চারদিনে ছ'টা না হলেও অন্তত পাঁচটা সেপারেটার তৈরি হয়ে যাওয়া উচিত। বিশেষ করে সুশীল পালের গ্রুপটাকে যখন কাজে লাগিয়েছে।

সুশীল পাল কোম্পানির চার্জম্যান, নন ম্যানেজমেন্ট ক্যাটিগরিতে সবচেয়ে উঁচু পোস্ট। যেমন সিনসিয়ার, তেমনই কাজের, বছরখানেক বাদে রিটায়ার করবে। গত বছর ম্যানেজমেন্ট ওকে অফিসার গ্রেডে প্রমোশন দিয়েছিল, কিন্তু সুশীল পাল নেয়নি। বলেছিল, 'আমার আর এই বয়সে ম্যানেজমেন্ট ক্যাডারে গিয়ে কাজ নেই, নন ম্যানেজমেন্টই ভালো।'

আসলে ম্যানেজমেন্ট ক্যাডারে ওভারটাইম নেই, সুশীল পালের মাইনেতে সেটা অনেক টাকার লস। তা ছাড়া ম্যানেজমেন্ট ক্যাডারে ইউনিয়ন করারও উপায় নেই। সুশীল পাল একসময়ে ইউনিয়নের বড় নেতা ছিল। এখন নেতা নেই ঠিকই কিন্তু ইউনিয়নের একজন মেম্বার, লোকেদের ওপরে ভালোই প্রভাব।

সেই সুশীল পালও এবারে হার মেনে গেল। কাজের গতি দেখে যেন বিরক্ত হয়ে উঠল। কমলকে বলল, 'যেভাবে কাজ হচ্ছে তাতে এক মাস কেন, তিন মাসেও সেপারেটারগুলো শেষ হবে কিনা সন্দেহ। তুমি বরং আশিস ঘোষকে বল, ইউনিয়নের সঙ্গে কথা বলুক। দরকার হলে রফিকুলকে ডাকুক। নইলে এরা আমার কথা শুনছে না, দশ মিনিটের কাজ নিয়ে সারা দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এতে যে কোম্পানির ক্ষতি হচ্ছে, সেটাও বুঝছে না। আরে বাবা কোম্পানিটা থাকলে তবে তো আমরা আছি, নইলে তো কেউই নেই। তাই তুমি আর দেরি কোরো না, আশিসবাবুকে বল। শেষে তুমিই ঝামেলায় পড়ে যাবে। তখন কেউ বাঁচাতে আসবে না। আর রফিকুল যেমন ইউনিয়নের সেক্রেটারি ঠিক তেমনই তো আমাদের ডিপার্টমেন্টাল রিপ্রেজেনটেটিভ। তাই ও ব্যবস্থা না করলে আর কে করবে?'

সুশীল পালও কাজের গতি দেখে যেন বিরক্ত হয়ে উঠল। কমলকে বলল, 'যেভাবে কাজ হচ্ছে তাতে এক মাস কেন, তিন মাসেও সেপারেটারগুলো শেষ হবে কিনা সন্দেহ। তুমি বরং আশিস ঘোষকে বল, ইউনিয়নের সঙ্গে কথা বলুক। দরকার হলে রফিকুলকে ডাকুক। নইলে এরা আমার কথা শুনছে না, দশ মিনিটের কাজ নিয়ে সারা দিন কাটিয়ে দিচ্ছে

'কিন্তু আশিসদা তো এখানে নেই, অফিসের কাজে মুম্বই গিয়েছেন।'

'আরে বাবা মুম্বই-ই তো গিয়েছেন, দেশের বাইরে তো যাননি? মুম্বইতেই ওঁকে ফোন করো — ফোনেই রফিকুলের সঙ্গে কথা বলতে বল।'

'কাল বলেছিলাম, বলল ফোনে কথা বলে কোনও লাভ হবে না, দরকার হলে সুপ্রিয় সাহেবকে বলতে।'

'সুপ্রিয় সাহেবকে? কিন্তু সুপ্রিয়সাহেব কি কিছু করবেন?'

'না করেননি, বলেছিলাম। পাত্তাই দেননি। বললেন নিজে সামলে নিতে।'

'সে তো বলবেনই। উনি তো তোমার ওপরে চটে আছেন। তুমি যে ওঁর মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছ। পল্যুশন বোর্ডে দেবেন বলে যে টাকাটা ভাউচারে তুলতেন, সেটা বন্ধ করে দিয়েছ।

তা ছাড়া এম্প্লয়েন্ট সঙ্গে যত তেল বাইরে যাবে, ততই ওঁর মজা। বাইরে গিয়ে কখনও দেখেছ? দুনী নদীতে পড়ার আগে ড্রেনটাতে অন্তত পাঁচ পাঁচটা গাড্ডা করা আছে — লোকাল দাদারাই করেছে — তেল ধরবে বলে। তাই যত তেল ওখানে ধরা পড়বে ততই সুপ্রিয়সাহেবের পকেট ফুলবে।'

(ক্রমশ)

অঙ্কন ঃ অভি

রসে বশে

লুঙ্গি-টুঙ্গি

প্রতিম বসু

আমার বাবা এককালে লুঙ্গি পরত। মা কোনওকালেই পছন্দ করত না। কিন্তু 'চলছে না, চলবে না' স্লোগান তোলা অবধি, বাবা চালিয়ে গিয়েছে। যে সে লুঙ্গি না। খাঁটি 'মুসলমান চেক' হওয়টা চাই। দুর্গাপুরে ও বস্তুটি বোধহয় সুবিধেমতো পাওয়া যেত না, তাই কলকাতায় এলেই বাবা গোটাকয় করে লুঙ্গি কিনত।

তখন আমরা মহাত্মা গান্ধী রোডকে হ্যারিসন রোড বলতাম। ইম্পেরিয়াল লজে থাকতাম। মাথার ওপর পেল্লায় ডিসি ফ্যান, বাথরুমে ইয়া বড় চৌবাচ্চা। মা 'দি ছায়া স্টোর্স (এয়ার কন্ডিশন্ড)' থেকে শাড়ি কিনত। দুপুরে হোটেলে ঝুরঝুরে আলুভাজা, ডাল, পটলের তরকারি আর প্রচুর তেল দিয়ে গরগরে করে রাঁধা রুইমাছের কালিয়া।

এত খেতাম, যে মা অবাক হয়ে যেত। এ ছাড়া পূরবীতে 'লালু ভুলু', বিশ্বরূপায় 'বড়দিদি' আছে। শুধু পার্ক স্ট্রিটে মা ডাক্তার দেখাতে গেলে, স্টিলেটোতে টক-টক শব্দ তুলে হেঁটে যাওয়া মিনি স্কার্ট। নটরাজ পেন্সিলের মতো উঠে যাওয়া অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পা আর আমার মুখ হাঁ। মুখ আর পেট এই অবধিই তো ছিল তখন।

এ সব যখনকার কথা তখন ছোটদের ছাড়া, পা বড় দুর্লভ। সিক্স পেরোলেই খেলার মাঠ ছাড়া ছেলেদের পাজামা। মেয়েরা ক্লাস সিক্স-সেভেন অবধি বোধহয় স্কার্ট পরত। তবে আজকের তুলনায় সেটাকে লুঙ্গি বলাই শ্রেয়। গোটা দুই হাতি ঢুকে যাবে এমন ঘের আর শেষ গোড়ালির ছ'সাত ইঞ্চি ওপরে।

মেরিলিন মনরো আর আমার বাবার মধ্যে মিল খুঁজতে গেলে ওই ওটুকুই পাওয়া যাবে — লুঙ্গি। তফাতের মধ্যে মনরোর স্কার্ট ঊর্ধ্বগামী আর লুঙ্গি সাধারণত অধোগামী। দু'হাতে জিনিস নিয়ে বাবা ব্যস্ত। এমন সময়ে ...ধপাস করে জিনিস মাটিতে, লুঙ্গি 'ইয়ো-ইয়ো'র মতো নীচে নেমেই, এক-ন্যানো মুহূর্তে ওপরে উঠে গেল। এবার আরও শক্ত করে গিঁট পড়ছে। ভানুর কমিক মনে আছে? সাহেব, ঢাকা ইস্টিশনে ট্রেনের কামরায় বসে মেমসাহেব প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো সাহেবকে 'যে চুমা দিল', সেই চুমা গিয়ে পড়ল, খুলনা না যশোর কোন স্টেশনে জানি, ইসমাইলের গালে।

ইসমাইল কোচোয়ান। মেমসাহেবকে নিতে এসেছিল। ইংরেজির 'লাইটনিং স্পিড' কোথায় লাগে।

তবে সবসময়ে ব্যাপারগুলো এমন ভানুচিত হত না। আমার এক বান্ধবীর, বিবাহবন্ধনীর ভাষায় সদ্য 'সঃ চাঃ' প্রাপ্ত, হিরো-কাটিং ছোটমামা লুঙ্গি-অন্তপ্রাণ ছিল। বসবার ঘরে টিভিতে সাপ্তাহিক 'চিত্রহার' চলছে। ভিতরে সারা পাড়ার কাকিমারা, সঙ্গে বান্ধবীর স্পেশাল ইনভিটেশনে আসা 'পাঠরতা, ফর্সা, সুন্দরী' বাবলি, টুম্পারা। বাইরে জানালার সামনে গোটা রক, মায় একটা ফুচকাওয়ালা সুদ্ধ দাঁড়িয়ে। অনুষ্ঠান শেষ হল। ঘরের লাইট জ্বলল। সঃচাঃ মামা উঠল। বাইরে গিয়ে ফিল্টার উইলস ধরাবে। আগে বিড়ি খেত। এমন সময়ে...লুঙ্গি খুলে গেল। গেল তো গেল। হতবাক মামা আর ওঠাতে পারল না। শেষে রিটায়ারমেন্ট এগিয়ে আসা বড়মামা তুলে ধরল, এমন কি পেটের ওপর গিঁটও মেরে দিল। সে এমন শক্ত গেরো, যে ছোটমামা বিয়েই করল না। একটা টেপ-রেকর্ডার আর তাতে 'ওয়াক্ত নে কিয়া কেয়া হাসি সিতম...' নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিল।

লুঙ্গির কেরামতি প্রথম দেখি ক্লাস ফাইভ নাগাদ। কালীপুজোয় আমরা বাজি পোড়াচ্ছি আর দাসকাকু হম্বিতম্বি করছে। কাকু অশোকদের নীচের কোয়ার্টারে থাকত। লুঙ্গি পরে হাতমুঠো করে নাম্বার টেন সিগারেট খেত আর কিৎ কিৎ থেকে ক্রিকেট সব ব্যাপারে আমাদের ওপর তম্বি করত। 'ডিউটি' না থাকলে ওটাই ডিউটি।

এমন সময়ে শিবুটা কোত্থেকে একটা ছুঁচো বাজি ছাড়ল। রকেট যেমন আকাশে যায় সেই একই ফর্মুলায় তৈরি। খালি ন্যাজে আগুন দিলে কোনদিকে যাবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কেউ জানে না। এঁকেবেঁকে দৌড়বে। এ সব দুর্দান্ত বাজি বাবা আমাকে দিত না। এ নিয়ে দুঃখ কম নেই। আমার বাবা বাঙাল, শিবুর বাবা নেপালি। আর নেপালিরা ভালো হয় কে না জানে।

ছুঁচো রানাদের ব্যালকনি ছুঁয়ে, বাবলিদি আর তার বাবরি চুল আর হাতির মতো বেলবটসওয়ালা টিচার শ্যামলদার পর্দা ফেলা ঘরে উঁকি দিয়ে, নাড়ুদের পেঁপেগাছ, জবা ঝোপের পাশে ঘুর ঘুর করেই, এক গোঁত খেয়ে সোজা দাসকাকুর পদপ্রান্তে।

ছুঁচোবাজি নড়াচড়া না করে শুধু ফরফর করছিল আর জোনাকির মতো পিছন দিয়ে আলো বেরোচ্ছিল। নাম্বার টেন আর লুঙ্গি নিয়ে, কাকু সুরজিতের মতো পায়ের আলতো টোকায়, সেটাকে লেবুর দিকে পাস দিতে গেল। তারপরেই কী যে হল, লুঙ্গির ভিতর থেকে অরোরা বোরিয়ালিসের মতো আলো বেরোতে লাগল। কাকু লুঙ্গি ছাড়াই বাড়ির দরজায় ডাইভ মারল আর সেখান থেকে হাসপাতালে। ফিরে এসে মাসখানেক লুঙ্গি পরে বাড়িতেই বসে ছিল। আস্তে আস্তে হাঁটত। তারপর শেষ — কাকু না, লুঙ্গি পরা আর তম্বি দু'টোই। খালি শিবুকে নাকি কখন একলা পেয়ে কানের নীচে এক-ঘা দিয়েছিল।

এবার উত্তমের কথা বলি। ইউনিভার্সিটির হোস্টেলে যারা রুমমেট ছিল তাদেরই একজন উত্তম। কলকাতা থেকে ঘণ্টাদুয়েকের দূরত্বে বাড়ি। রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ ঘুরে যাদবপুরে এসেছে, রিসার্চ করতে।

মুশকিল হল, এরপর থেকেই উত্তম, শীর্ষেন্দুর গল্পের চোর হয়ে গেল। বোঝা যাচ্ছে, আছে অথচ দেখা যাচ্ছে না। সকাল আটটায় গাত্রোত্থান করে দেখব সে ঘুমোচ্ছে। যাদবপুর থানার মোড়ে, প্রকাশের দোকানে চা-টোস্ট খেয়ে যখন হেলেদুলে হোস্টেলে ফেরত, ততক্ষণে উত্তম 'ডিপার্টমেন্ট'।

বিকেলেও এইরকম রুটিন। রাত সাড়ে নটা-দশটার সময়ে যখন খেতে যাচ্ছি তখনও বাবুর পাত্তা নেই। খাওয়া সেরে ঘণ্টা-দেড় কমনরুমে কাটিয়ে এসে দেখব, সে উপুড় হয়ে ঘুম দিচ্ছে। আর শুক্রবার হলে তো কথাই নেই। ইউনিভার্সিটি থেকে বাড়ি, ফের সোমবার রাতে ইউনিভার্সিটি ঘুরে সবার অলক্ষ্যে বিছানায়।

এই ম্যাজিক রিয়েলিজমের মাঝে একটাই রিয়েল ব্যাপার ছিল — লুঙ্গি। উত্তম লুঙ্গি পরত। শুধু ও না। হোস্টেলে গ্রাম ও শহরতলি থেকে আসা আরও কিছু লুঙ্গিপ্রেমী ছিল। তবে আমাদের রুমে উত্তম এক এবং অদ্বিতীয়।

লুঙ্গি — 'ল' অনুযায়ী, ভোরের দিকে ঠান্ডা ঠান্ডা লাগলেই সেটা অগ্রন্থিত হয়ে গায়ের ঢাকা হবে। এরপর একটা জটিল অঙ্ক আছে। যদিও আমাদের রুমে সবাই অঙ্কে ভালো ছিল, ক্লান্তির জন্যই বোধহয়, উত্তমের মাঝে মাঝেই একটু সিলি মিসটেক হত। ও যখন লুঙ্গিতে মাথা ঢেকে ঘুমোত, তখন আর কী হত বলাই বাহুল্য ঠেকে ঠেকে আমাদেরও অভ্যেস হয়ে গেল ও-খাটের দিকে না তাকানো।

এটা কিন্তু সমস্যা না। কোনওদিন ছিল না। ঘটনা হল, এতদিন পরে, গল্প করতে বসে দেখি, উত্তমের সবুজ লুঙ্গির কথা মনে আছে। খালি মুখটাই ভালো করে মনে পড়ছে না। সিকি শতাব্দী আগে যেদিন হোস্টেল ছাড়ি সেদিনও ও ব্যস্ত ছিল। তারপর আমরা দু'জনেই ব্যস্ত। স্মৃতিতে কখন পোকা লেগেছে জানতেই পারিনি।

অঙ্কন ঃ অভি